ইউনিভার্সিটি বি.টি. অ্যান্ড ইভনিং কলেজ

কোচবিহার

আবহমান

বার্ষিক পত্রিকা

২০২৬ সংখ্যা

আবহমান

বা র্ষি ক প ত্রি কা

ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজ

কোচবিহার

প্রকাশ বর্ষ ২০২৬
প্রকাশকঃ মাননীয় অধ্যক্ষা, ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজ।
অবাণিজ্যিক প্রকাশনা, এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের
মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

সূ চী প ত্র

শুভেচ্ছা বার্তা | ড. স্বপন কুমার রক্ষিত (Jt. Registrar, NBU)
অধ্যক্ষার ডেস্ক থেকে | ড. অঙ্কিতা মুখার্জী
সম্পাদকীয় | ড. অনিন্দ্য ভট্টাচার্য

প্র ব ন্ধ মা লা

পৃষ্ঠা ১১-২৬

ড. জয়দীপ সরকার | ড. রিকি চক্রবর্তী | উজ্জ্বল মোদক |
ড. আবীর কুমার দাস | ড. অভিজিৎ সরকার | প্রিয়াঙ্কা মজুমদার

ক বি তা গু চ্ছ

পৃষ্ঠা ২৭-৪০

ড. অঙ্কিতা মুখোপাধ্যায় | ড. সুব্রত মান্না | ড. পঙ্কজ সরকার | বাবাই সিং |
রুবিয়া সুলতানা | রাকা ঘোষ | নন্দিনী সরকার | মৈনাক অধিকারী |
ঋষিতা দে | তনু রায় | অমিত কুমার দাস | সুমন্ত লাল ঘোষ |
ড. কারিশ্মা ওঁরাও

ছো ট গ ল্প

পৃষ্ঠা ৪১-৫৪

ড. অনিন্দ্য ভট্টাচার্য | প্রিয়াঙ্কা কুণ্ডু | অনুরাগ রায় | জয়িতা রায় | বীথি সূত্রধর

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Raja Rammohunpur, Darjeeling

Message

It is a profound delight to once again welcome the flow of ideas embodied in "Abahoman" — the Annual College Magazine of University B.T. & Evening College. Far more than a mere compilation of writings, it stands as a living chronicle where imagination converges with inquiry and where the voices of both teachers and students form the very pulse of our academic community. The title "Abahoman" itself signifies continuity — an unceasing stream of tradition, learning, and creativity, coursing from one generation to the next, nurturing thought, vision and wonder.

May this edition stir minds, enlighten hearts and deepen the rich legacy of our institution. My heartfelt congratulations to the Editorial Board, the Contributors and all who have nurtured this creation. May "Abahoman" continue to shine as a beacon of intellect and a vibrant celebration of the human spirit.

Dr. Swapan Kumar Rakshit
Joint Registrar,
Raja Rammohunpur Campus,
University of North Bengal
&
Director,
NBU, Jalpaiguri Campus

অধ্যক্ষার ডেস্ক থেকে

‘আবহমান’— কেবলমাত্র একটি পত্রিকা নয়, বরং বহমান সময়ের স্রোতে ভেসে চলা আমাদের চিন্তা, কল্পনা ও সৃজনশীলতার নৌকা। প্রতিটি লেখা একেকটি দীপশিখা, যা অন্ধকারে আলো জ্বালায়; প্রতিটি শিল্পকর্ম একেকটি রঙিন পাখি, যা মুক্ত আকাশে ডানা মেলতে চায়। এর প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি রঙ, প্রতিটি ভাবনা আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রাণশক্তিকে বহন করে নিয়ে আসে অতীত থেকে বর্তমানে, আর বর্তমান থেকে নিয়ে যায় ভবিষ্যতের দিকে।

আমরা জানি শিক্ষা কেবল পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ নয়; এটি এক অন্তর্লীন যাত্রা, যেখানে চিন্তা, সৃজনশীলতা ও মানবিকতা মিলেমিশে গড়ে তোলে নতুন দিগন্ত। ‘আবহমান’ সেই যাত্রারই এক বিমূর্ত প্রতীক—যেখানে ছাত্রছাত্রীদের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, শিল্পকর্ম আর স্বপ্ন মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে একান্ত প্রবহমান নবচেতনাস্রোত। প্রতিটি রচনার ভেতরে লুকিয়ে থাকে একেকটি জীবনবীক্ষা, যা পাঠকের অন্তরে নতুন চিন্তার জন্ম দেয়। চেতনার নভোনীলে ডানা মেলে উড়ে যায় মথিত মন, আঁকা হয় প্রজ্ঞার রামধনু।

আমি বিশ্বাস করি, ‘আবহমান’ এর প্রতিটি রচনার ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে সেই সুনিশ্চিত সম্ভাবনা, যা প্রজ্জ্বলিত হয়ে আমাদের কলেজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করবে এবং প্রতিটি পাঠকের হৃদয়ে অনন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

মাননীয় সম্পাদক এবং এই পত্রিকা প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সম্মানীয় অধ্যাপকবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা তাঁদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আমাদের প্রতিষ্ঠানকে গৌরবান্বিত করবে, এই আশা। 'আবহমান' হোক আমাদের বিবক্ষার পানসি, সম্মুখে যার কেবলই উজান।

ড. অঙ্কিতা মুখার্জী
অধ্যক্ষা
ইউনিভার্সিটি বি. টি. অ্যান্ড ইভনিং কলেজ
কোচবিহার

সম্পাদকীয়

শারদোৎসব নাটকে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, ছুটি শব্দের অর্থ কর্মহীন অবকাশ নয়, বরং প্রিয় কাজে কোমর বেঁধে সবাই মিলে লেগে পড়ার যে আনন্দ, শরতের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়া সংগীতময় সেই কাজের উৎসবের নামই হল ছুটি। শিক্ষক হিসেবে আমাদের একটা বড় সুবিধে হল, ক্লাসরুমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যে জ্ঞানের আদান-প্রদান, সেটা অনেক সময়েই একটা নির্ভেজাল আনন্দময় আড্ডা, যদি ছাত্রছাত্রীরা একটু মনোযোগ দেয় আর বুঝতে চেষ্টা করে। আমাদের কলেজের বিশেষ সেলগুলির প্রচেষ্টায় এই প্রান্তিক জেলার ছেলেমেয়েগুলির মুখে একটু হাসি ফোটানোর আন্তরিক কর্মযজ্ঞে নেমেছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা; বিশেষ ভাবে শিক্ষিকাদের কথা বলতেই হয়। ইদানীং আমাদের এই ছোট্ট কলেজে যে আনন্দময় কাজের জোয়ার এসেছে, এই পত্রিকা তারই একটা অংশ মাত্র।

অধ্যাপকরা অনেকেই অ্যাকাডেমিক লেখালিখির পরেও বিভিন্ন প্ল্যাটফরমে সৃজনশীল লেখালিখি করেন। তাঁরা কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠিয়ে আমাদের এই ছোট্ট তরী সোনার ধানে ভরে দিয়েছেন, এবং ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিয়েছেন। এজন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করব না। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই আমাদের নবীন অধ্যক্ষা ড. অঙ্কিতা মুখার্জীর কথা, যাঁর উৎসাহে এই বার্ষিক পত্রিকা নবকলেবরে আত্মপ্রকাশ করল।

কলেজের সকল শুভানুধ্যায়ী ও কলেজ পরিচালন সমিতির মাননীয় সদস্যদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি।

ড. অনিন্দ্য ভট্টাচার্য
ইংরেজি বিভাগ

আবহমান

সাংস্কৃতিক ভ্রমণ ও উত্তরবঙ্গের সম্ভাবনা

ড. জ য় দী প   স র কা র
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

নাগাল্যান্ডে প্রায় ১৬টিরও বেশি স্বতন্ত্র উপজাতি আছে। প্রত্যেক উপজাতির রয়েছে নিজস্ব ভাষা, গান, নাচ, পোশাক, উৎসব ও রীতি। ২০০০ সালে, নাগাল্যান্ড সরকার উদ্যোগ নিয়ে রাজ্যের নানা উপজাতির বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে একত্রে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে "হর্নবিল উৎসব"এর সূচনা করেন। মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে এই উৎসব আন্তর্জাতিক স্তরে এমন সমাদর পেয়েছে যে প্রতি বছর ডিসেম্বরের এক তারিখ থেকে দশ তারিখ এই উৎসবের জন্য সেপ্টেম্বর মাস থেকেই গাড়ি, হোটেল বুক করতে শুরু করেন ভ্রমণপিপাসু মানুষ। নভেম্বর মাস পড়ে গেলে হোটেল, গাড়ি পাওয়া খুবই কষ্টকর হয়ে যায়। গত বছর প্রায় ২ লক্ষ ৭৫ হাজার মানুষ এই উৎসবে সামিল হয়েছিলেন, যার মধ্যে ভিনদেশ ও রাজ্য থেকে ভ্রমণপিপাসু মানুষের সংখ্যা ছিল কম বেশি ৬০ হাজার। নাগাল্যান্ডের অর্থনীতিতেও এই উৎসব তাই গুরুত্বপুর্ণ। কিন্তু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ সরিয়ে রাখলে, যা আরো বেশি গুরুত্বের দাবি করে সেটা হল, হর্নবিল উৎসব যেহেতু শুধু বিনোদন নয়,

বরং সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ, আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যম, যে ভ্রমণকারীরা এই উৎসবে সামিল হন তাদের ভ্রমণের চাহিদার প্রকৃতি অনুসন্ধান করা।

খুব সম্প্রতি প্রকাশিত স্কাইস্ক্যানারের একটি রিপোর্টে জানা গেছে, এখন প্রতি ১০ জন ভারতীয় ভ্রমণকারীর মধ্যে ৮ জন এমন ভ্রমণ বেছে নিচ্ছেন, যেখানে সাংস্কৃতিক মিশ্রণই মুখ্য। তারা খুঁজছেন এমন অভিজ্ঞতা, যা তাদের ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে। ভ্রমণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞরা যেটা জানাচ্ছেন, কলকাতার দুর্গাপুজো বা কেরালার ওনামের মত উৎসবের পাশাপাশি ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করছে ছোট ও কম পরিচিত উৎসবগুলো—যেমন কর্ণাটকের উপকূল অঞ্চলের ভূত কোলা, উত্তর কেরালার তেয়্যম এবং গোয়ার চিকল কালো, ইত্যাদি।

হর্নবিল উৎসব

আজকের ভ্রমণকারীরা শুধু তালিকা মেনে গন্তব্য চিহ্নিত করলেই সন্তুষ্ট নন; তারা স্থানিক সংস্কৃতিকে উপভোগ করতে চান। স্কাইস্ক্যানার ট্রাভেল ট্রেন্ডস

অ্যান্ড ডেস্টিনেশন বিশেষজ্ঞ নীল ঘোষ এই পরিবর্তনকে বলেছেন "সংস্কৃতিপ্রবণ ভ্রমণকারীর উত্থান: এমন এক ভ্রমণকারী, যে খোঁজে জ্ঞান, সংযোগ আর পূর্ণতা।" তাদের কাছে ভ্রমণের সাফল্যের মানদণ্ড হল ভ্রমণ শেষে বাড়ি নিয়ে আসা গল্প, যা মানুষ আর স্থানের প্রতি তাদের অনুভূতিকে আরও গভীর করে তোলে। খুব সম্প্রতি কুম্ভমেলাকে কেন্দ্র করে যে পর্যটকের ঢল নেমেছিল প্রয়াগরাজে, ধর্মপ্রাণ মানুষের পাশাপাশি একটা বড় অংশের মানুষ কিন্তু এমনও ছিলেন, কুম্ভের মধ্য দিয়ে ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে বুঝতে যারা পাড়ি দিয়েছিলেন অনেকটা পথ।

দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বাংলায় যে ভ্রমণকারীদের আগমন ঘটে সেটা মূলতঃ কলকাতাকেন্দ্রিক। খুব সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে দিনহাটার মত ছোট শহরে দুর্গাপুজোয় প্রচুর মানুষের সমাগম হচ্ছে পড়শি রাজ্য আসাম থেকেও। ধূপগুড়ির কালীপুজোকে কেন্দ্র করেও এই ধরণের জনসমাগম ঘটে। এগুলো অর্থনীতির ক্ষেত্রে বড় প্রভাব ফেলে, কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে মেজাজটা এখনো পিকনিকের মুড থেকে ভ্রমণে উন্নীত হয়নি। কোচবিহারের রাসমেলাকে নিয়ে যে সাংস্কৃতিক যাপন তাতে এই সাংস্কৃতিক ভ্রমণ যোগের খানিকটা যোগান আছে। একটা বড় পরিকল্পনা রাসমেলাকে কিন্তু একটা হর্নবিল উৎসবে বদলে দিতে পারে। আর উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য? টিউলিপের সময়ে কাশ্মীর যাওয়ার স্বপ্ন, সে তো ছিল, আছে, থাকবে; পলাশের জন্য পুরুলিয়া কিন্তু খুব অল্প দিনেই জনপ্রিয় হয়েছে; চাইলে জারুল দিনে ডুয়ার্সকেও আমরা পর্যটন মানচিত্রে তুলে আনতে পারি। প্রয়োজন শুধু একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা।

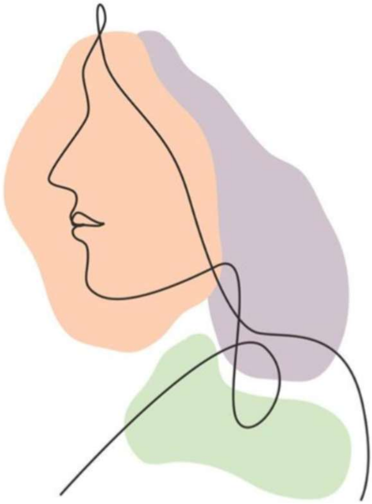

অনুভব

ড. রি কি চ ক্র ব র্তী
অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ

ভাবছিলাম অনুভবের কথা।

জীবনের নানান পর্যায়ে অনুভব এবং তার প্রকাশের ধারার বদল হয়। ছোট্টবেলায় অনুভব এবং তার প্রকাশ প্রায় এক সাথেই হয়, যা মনে হলো তার প্রকাশ হয় নানা ভাবে - ভাষায়, ভাবে, আনন্দে, অশ্রুতে। কিন্তু যৌবনে অনুভব বেশ সোচ্চারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সুপ্ত অনুভবটুকু সঞ্চিত থাকে তার মৌল আবেগে।

পরিণত যৌবনে অনুভবের চেহারা খানিকটা আলাদা, এখানে বিচারের আশ্রয়ে পরিণত হয় অনুভব, অবশ্য তার গুণ বদল হয় না। এই

অনুভব নিজেকে একেবারে মনের নিভৃতে গুটিয়ে নিয়ে আবার আশ্চর্যভাবে সঞ্চারিত ও করতে পারে অপরের মনে।

ভাষাতেই অনুভবের সমাপ্তি, কিন্তু যেখানে ভাষা নেই, প্রকাশের আর কোন পথ নেই, সেখানে অনুভব হৃদয়ের ঘেরে কেঁদে মরে। জীবনটা একটা গাণিতিক সীমানাকে স্বীকার করে চলে ঠিকই, কিন্তু মানুষ বেহিসেবী ভাবটা আঁকড়ে রাখে বলেই তার মধ্যে প্রাণের মহিমা সঞ্চারিত হয়, এই দুই ভাব মূর্তির মেলবন্ধন মানুষের জীবনে হয় বলেই সে অগ্রগতির পথকে দেখতে পায় এবং যে পারে না, সে হয় জগতের বস্তুপুঞ্জের মাঝে হাবুডুবু খায়, নতুবা বেশী ভাবুকতায় সব হারায়।

তাই ভাবলাম অনুভব কিন্তু বেশ দামি।

The Legacy of Sanskrit

Ujjwal Modak
Teacher, Department of Sanskrit

Sanskrit is the most ancient, perfect, and indigenous of the world's major languages. This language is a genuine representation of the enduring Indian tradition. Sanskrit is revered as the language of the Gods and the mother of the Indian language in India. Sanskrit is not only a classical language, but also a repository of a significant portion of our ancient cultural heritage. It is also widely recognised as the origin or foundation of various sciences, such as physics, chemistry, botany, zoology, mathematics, agriculture, environmental science, geometry, astrology, and medicine.

In our day, Sanskrit is nearly indispensable for the comprehensive development of humanity, as it is essential for all individuals to comprehend and apply the contemporary values of Indian culture. Sanskrit is the most intriguing scientific language in the universe. It is an ideal medium of communication; Sir Willam Jones, in his address to the Royal Asiatic Society of Bengal, has stated, "The Sanskrit language,

regardless of its antiquity, is of a wonderful structure, more perfect than Greek, more copious than Latin, and more refined than either." The Sanskrit Devanagari script was not only suitable, but it also precisely met all of the requirements for an optimal medium of use. Sanskrit literature is a testament to the humanism that emphasises the unity of humanity, mutual understanding, and harmonious development of both individuals and society.

In the future, we would be able to utilise Sanskrit as a language for the new technology and as a medium for proficiency in computer operations. Sanskrit is a priceless treasure, a repository of human history that encompasses Philosophy (Vedanta and Yoga), Political Science and Economics (Arthasastra), and Science (Ayurveda, Astronomy, Mathematics). By gaining access to these primary sources, society would be able to integrate historical solutions with modern challenges. Sanskrit, the classical origin of the majority of modern Indian languages, unites a variety of linguistic communities by revealing a shared cultural heritage. Sanskrit treatises function as a collection of moral principles and examples of virtuous behaviour. Concepts such as *Vasudhaiva Kutumbakam*, "The world is one family" and "*Ahimsa*" (nonviolence) promote global harmony.

In summary, we are currently in a period in which academicians worldwide are endeavouring to comprehend the potential of the ancient knowledge that the Sanskrit language has unlocked for the advancement of human civilisation.

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক নিয়ে কিছু ভাবনা

ড. আ বী র কু মা র দা স
শিক্ষক, দর্শন বিভাগ

একটি সুমধুর শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা। কারণ শিক্ষাব্যবস্থার দুটি মূল স্তম্ভ হল শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। শিক্ষক

ব্যতীত যেমন শিক্ষাব্যবস্থা সম্ভব নয় তেমনি শিক্ষার্থী ছাড়া শিক্ষা শব্দটি অর্থহীন। কিন্তু বর্তমানে এই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সুমধুর সম্পর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত হয়েছে এবং তার সবথেকে বেশি নিদর্শন পাওয়া যায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে। এই তিক্ত সম্পর্কের বিশ্লেষণে প্রথমেই যে কারণটি ভেসে ওঠে তা হল শিক্ষায় রাজনীতিকরণ ও ছাত্ররাজনীতি। আবার কেবলমাত্র ছাত্ররাজনীতি বা শিক্ষায় রাজনীতিকরণই এই তিক্ত সম্পর্কের মূল কারণ নয়। বর্তমানে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের অভাব এবং বাহ্যিক বস্তুজগতের প্রতি আকর্ষণই এই তিক্ত সম্পর্কের মূল কারণ। যদি আমরা বৈদিক যুগ অনুসরণ

করি তবে দেখবো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। বৈদিক যুগে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সামাজিকভাবে ও আধ্যাত্মিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। শিক্ষককে শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক পিতা রূপে গণ্য করা হত এবং তিনি গুরু ও পথ প্রদর্শকরূপে গণ্য হতেন। তিনি শিক্ষার্থীদের অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকিত পথে পৌঁছে দিতে পারেন। এই সম্পর্ক ছিল জীবনব্যাপী। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো নিখুঁত ও প্রগতিশীল, কারণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি পবিত্র ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল যার অভাব আমরা সাম্প্রতিককালে অনুভব করি।

শিক্ষার্থীরা জাতির ভবিষ্যৎ এবং একজন শিক্ষক হলেন একজন মানবসম্পদ যিনি সমাজ ও দেশের সার্বিক উন্নয়নের কারিগর। একজন শিক্ষকের কিছু গুণাবলী থাকা দরকার যেগুলি তাকে আদর্শ শিক্ষকে পরিণত করে এবং একজন আদর্শ শিক্ষকই শিক্ষার্থীদের মনোবল বৃদ্ধি করতে এবং জীবনের বিভিন্ন প্রতিকূলতা প্রতিরোধ করতে তাঁদের পথ দেখাতে পারেন। তাঁকে অবশ্যই নিরপেক্ষ এবং ধৈর্যশীল হতে হবে এবং তাঁর অবশ্যই সমস্যা সমাধানের দক্ষতা থাকা দরকার যার দ্বারা তিনি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেন। একজন আদর্শ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেন এবং ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে রক্ষা করেন। আসলে একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা এই সর্বময় অভিভাবকত্বের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে এবং এই সম্পর্ক জগতের সর্বোৎকৃষ্ট এবং শুদ্ধ সম্পর্ক। এমনকি আমরা যদি বিভিন্ন হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীগুলি লক্ষ্য করি তবে দেখবো সেখানেও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সুমধুর সম্পর্কের অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন- ঋষি পরশুরাম ও ভীষ্মদেবের সুমধুর সম্পর্ক, যা গড়ে উঠেছিল শ্রদ্ধা, উৎসর্গ ও অঙ্গীকারের উপর ভিত্তি করে। আমরা যদি হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীগুলি লক্ষ্য করি তবে দেখব যে

সেখানে শিক্ষককে পিতা, মাতা, এবং আধ্যাত্মিক গুরু রূপে গণ্য করা হত। একজন আদর্শ শিক্ষক হলেন তিনি, যিনি শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে পারেন যার দ্বারা একজন শিক্ষার্থী তার জীবনে বৌদ্ধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সমস্যার বিষয় হল, বর্তমানে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করেছে লাভ-ক্ষতির হিসেব এবং এই হিসেবের ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীদের মনে শিক্ষক সম্পর্কে গড়ে উঠেছে বিরূপ মনোভাব এবং শিক্ষাদানও হয়ে উঠেছে জীবিকা নির্বাহের লাভদায়ক উপায়। তাই বর্তমানে কর্তব্যজ্ঞানে শিক্ষাদানের পরিবর্তে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কেবলমাত্র জীবিকা রূপে। ফলে একজন শিক্ষক বর্তমানে শিক্ষার্থীদের কাছে হয়ে উঠেছেন একটি নির্দিষ্ট পাঠক্রম সমাপ্ত করার মাধ্যম স্বরূপ। ফলে তাঁদের মধ্যে কোনো সদর্থক সুমধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। আসলে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করা ও লাভজনক উপায় স্বরূপ শিক্ষাকে গ্রহণ করলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কখনোই সুমধুর হতে পারে না। ফলে প্রথাগত গুরু শিষ্য সম্পর্ক বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। বর্তমানে কিছু শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং ফলস্বরূপ সমস্ত শিক্ষকদের প্রতিই শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা ও মনোযোগ ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। এখন প্রশ্ন হল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি সদর্থক সম্পর্ক কিভাবে গড়ে উঠতে পারে? এর উত্তরে বলা যায় একজন শিক্ষক যদি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থাকে অগ্রাহ্য করে ন্যায়সঙ্গত ও পক্ষপাতহীন ভাবে আচরণ করেন তবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি সদর্থক ও সুন্দর সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। মনে রাখা দরকার একজন মানসিক বিকারগ্রস্ত শিক্ষক একজন মানসিক বিকারগ্রস্ত শিক্ষার্থী তৈরী করেন। তাই শিক্ষকের মানসিক উৎকর্ষতার উপর নির্ভর করেই একটি সদর্থক শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব।

সর্বশেষে বলা যায় যে, সৎ ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদা, সম্যক জ্ঞান, কর্মের প্রতি সততা একজন আদর্শ শিক্ষকের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য। তিনি হলেন একটি প্রগতিশীল সমাজ গঠনের কারিগর যে সমাজে একজন শিক্ষার্থী স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন চিন্তার অধিকারী হবে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হওয়া উচিত আত্মিক ও বন্ধুত্বের। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষা কোনো পণ্য নয়, এটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সদর্থক ও সুমধুর যোগাযোগের মাধ্যম। কারণ শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবন ও আদর্শ সরাসরি শিক্ষার্থীর উপর প্রভাব বিস্তার করে। আসলে একজন আদর্শ শিক্ষকের জীবন তপস্যার জীবন।

Application of Porous structures in Mathematical model related to Water wave Theory

Abhijit Sarkar
Department of Mathematics

Various types of porous breakwaters have been proposed by researchers for the protection of coastal regions and construction sites. Porous structures reduce the wave loads and wave run-up on them. These structures are very flexible, reusable and can be used to develop low-cost wave attenuation and protection systems. Vertical cylinders are generally used in the construction of coastal and offshore structures due to various applications. Examples are floating airports, semi-submersibles, wave power energy conversion system (Figure 1) etc. Various porous structures are used to create oil rigs. Sea-cage culture is also based on porous structures. Further, Very Large Floating Structures (VLFS), such as floating airports, bridges, breakwaters, piers, docks etc. are constructed with the help of porous structures.

To design marine structures, it is necessary to take into account a number of atmospheric conditions and to devise accurate prediction of hydrodynamic impact on the structures. Therefore, research has especially been focused on optimizing the system to avoid significant hydrodynamic impacts. The concept to use porous surface bodies is to reduce the influence of wave-body interaction through the pores on the body surface. Especially, offshore wind energy has gained attention from many countries to find alternative and reliable source of energy. South Korea has decided to invest 9 billion dollars in building a 2.5 GW offshore wind force in the south west sea of Korea. The size of the substructure for wind turbine increases due to the size of the tower and the rotor nackle becomes larger with increment of gross generation. The substructures are substantially affected by the wave force. Therefore, an important goal is to reduce wave loads on

substructures. One possible way is to use a structure with porous surface.

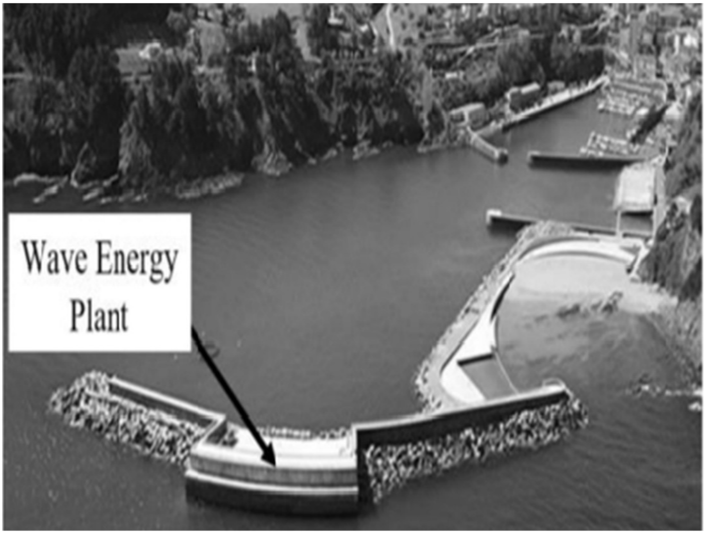

Figure 1

The whole world witnessed global fuel crisis in 1970. From then onwards, the concept of bringing renewable energy into fore has kicked off. Along side, a sizeable endeavour has been undertaken precisely on research and burgeoning activities, including solar, wind and ocean energy. This stepping forward has come to the aid of strengthening the study of the existing gap between renewable and non-renewable energy. In the recent past, it has been observed that WEC (Wave Energy Converter) systems require high cost in comparison with traditional electricity produced from coal power plants. The appealing power of the WEC can be enhanced through the consolidation of the WEC into other structures related to maritime such as breakwater pier or jetty. The following are the gathered outcomes from the consolidation of breakwater and wave energy device over the stand-alone wave energy device.

- Overtopping WEC-breakwater integration.
- Oscillating water column and WEC-breakwater integration.
- Piston-Type Porous Wave Energy Converter (PTPWEC) integration.

Two identified current important projects in connection with breakwater integration are ``The Mutriku Wave Energy Plant'' situated in Mutriku on the northern coast of Spain between San Sebastian and Bilbao and ``Siadar Wave Energy Project'' situated in Siadar Bay, in Lewis, Scotland. Another porous breakwater project is the semi-circular breakwater concept constructed at Miyazaki Port, Japan.

Figure 2

Offshore wind power or wind energy can be harnessed by installing wind farms in any large water body, usually in an ocean on the continental shelf. The harvested wind energy can be appropriately converted to get electricity. A good number of wind energy power resources are available worldwide. The sea south-west to the Gulf of Cadiz in Spain is one such prime source of wind energy. Two identified current important projects in connection with wind energy harvesting are ``Mar de Trafalgar'' in Spain and ``A Pioneer Project of Aquaculture-Wind Farm Multi-Uses'' in German North Sea. Both projects plan to integrate aquaculture with wind energy production. The main objective of such projects is to construct a storage tank surrounding the circular cylinder of the aero generators for aquaculture (Figure 2). Under appropriate conditions, multiple use of a marine site through co-location of such complementary activities will definitely lead to more efficient utilization of ocean space which augurs well for nature. The best way to explore the economic benefit and ocean space utilization through multi-use and co-location is probably to initiate developing aquaculture co-located within the structure serving as an ocean wind farm. Such co-location of two activities of aquaculture and wind energy generation will result in cutting down expenditure on both public and private fronts. The public benefits are due to such common structural arrangement not negatively affecting the ecosystem services derived from the ocean area which would have otherwise occupied and exhausted more space. The private benefits are in the form of cost savings arising from sharing of infrastructure, logistics efforts and systems.

প্রকৃতি ও আমরা

প্রিয়াঙ্কা মজুমদার
ছাত্রী, ইতিহাস বিভাগ

প্রকৃতি কি ঈশ্বরের দেওয়া শ্রেষ্ঠ উপহার, নাকি মহাবিশ্বের এক বিস্ময়কর ভুল? যাই হোক না কেন, পৃথিবীর এই সৃষ্টির কিছু মানুষের হাতে গড়া, আর কিছু প্রকৃতির নিজস্ব শিল্প। আমরা যা প্রকৃতিকে দিই, প্রকৃতিও তাই আমাদের ফিরিয়ে দেয়— এই দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কই গড়ে তোলে আমাদের অস্তিত্ব।

গাছ শুধু বেঁচে থাকে না, তারা জীবন দেয়। আমাদের ছায়া দেয়, আশ্রয় দেয়, বিশুদ্ধ অক্সিজেন জোগায়, আর নীরবে পৃথিবীকে সজীব রাখে।

পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো ও অমূল্য তরল হলো জল। এই জলই আমাদের তৃষ্ণা মেটায়, জীবন বাঁচায়। অথচ পৃথিবীর বেশিরভাগ জল লবণাক্ত—পানযোগ্য জলের পরিমাণ মাত্র ১ থেকে ২ শতাংশ।

মাটি আমাদের অন্নদাতা। বিভিন্ন ধরনের মাটিতে জন্মায় নানা ফসল। কিন্তু প্রশ্ন জাগে— আমরা কি সব ধরনের মাটিতে সমানভাবে ফসল ফলাতে পারি? আবহাওয়া কৃষির বন্ধু, কৃষকদের ভালো ফসল ফলাতে সাহায্য করে। কৃষকের মুখে চওড়া হাসি ফোটায়।

প্রাণীজগৎ এই ভারসাম্যের আরেক স্তম্ভ। বন, নদী, মাঠ— সর্বত্র প্রাণীরা তাদের ভূমিকা পালন করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে।

প্রকৃতি আমাদের যা কিছু দেয়, সবই আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য। মানুষ ছাড়া প্রকৃতি অনায়াসে টিকে থাকতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি ছাড়া মানুষ এক মুহূর্তও বাঁচতে পারে না।

ক বি তা গু চ্ছ

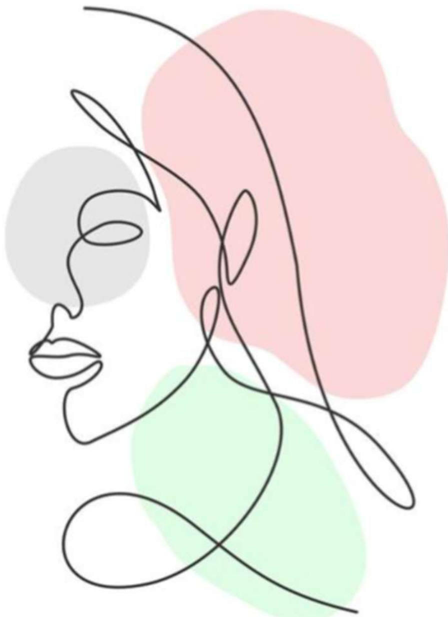

সুর

ড. অঙ্কিতা মুখার্জী
অধ্যক্ষা,
ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজ

রাতের নিশ্ছিদ্র আঁধারে
স্বপ্নেরা মিশে যায় বিন্দু বিন্দু দেহে!
ঘুম ভাঙা চিবুক বেয়ে
নেমে আসে কালো মেঘ,
বিন্দুতে লুকিয়ে থাকে ধূসর নদী।
হাতড়াই চাবিকাঠি, জীবনের
ফলিত বেদনার উদাস আয়নায়
দাঁড়িয়ে অপলক নীরব প্রত্যাশা;
অপরূপ জীবনের বন্দি বৃত্ত
কেবলই শূন্য, ক্রমশ বিষাদ।

দুঃখনদী

ড. সুব্রত মান্না
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এই পলাশ রাঙা মন
মাতোয়ারা মৌ বন
একে ছেড়ে কোন রাঙাপথ,
কোন নদীপথ যাই!
আমার যাবার উপায় নাই।

আমি যখন যেথায় যাই
মুক্ত বাতাস পাই,
আমার নিত্যদিনের আলোর খোঁজে
খুশির সীমা নাই।

আমি লাল পলাশের ডাল
মত্ত মায়াজাল
আজকের এই খুশির রঙে
বদলে যাবে কাল।

একমুঠো রঙ প্রাণের মাঝে
খবর কি তা পাও
তাই চাইতে পারো, না চাও তো
তোমার পথেই যাও।

আমি আমার মতো রই
আমি একলা নদী হই
কখনো বা সমুদ্রতীর
মগ্ন পাহাড় হই।

আমি দুঃখ স'য়ে রই,
আমি কষ্ট স'য়ে রই
কেমন হতো, তোমার সাথে
যদি দুঃখনদী হই।

অন্ধ

বাবাই সিং
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ।

কবি বলে সে অন্ধ, আমি বলি সে মন্দ নয়,
মন্দ নয় সে, যে আপন খেয়াল ভরে
হাল ধরে জীবনের, অন্ধ বলেই সে পারে।
অন্ধ বলেই চুপ করে রয়, আপনা থেকেই গায় গান।
অন্ধ সে তো সমাজ বলে, ধর্ম তার জয়গান।
সমাজ তিক্ত আপন মনে, তিক্ত কবির কবিতা।
তিক্ত সমাজ গর্জে ওঠে, ম্লান হয়ে আসে সবিতা।
সমাজ সে তো মৃত্যু খেলায়, রং মেখেছে অঘটন।
যন্ত্র নিয়ে করছে খেলা, যৌবন আজ নিরুপায়।
অন্ধ সে তো ঠিকই বলে, চাও যদি ফিরে দৃষ্টি।
সৌভাতৃত্ব, প্রেম বিনিময়ে ভরিয়ে তোলো কৃষ্টি।

শূন্য

ড. পঙ্কজ সরকার
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

মাঝে মাঝেই মনে হয় কিছুই নেই, চারিদিক ফাঁকা নিস্তব্ধ,
তবে কি নেই কেন নেই বুঝে উঠতে পারার সাথেই মিলিয়ে যায়।
আবারও মনে হয় এইতো দিব্যি আছি, তবুও কি যেন নেই,
সেকি শূন্য, নাকি কিছু নেইটার অনুভূতিটা একটা কিছুকে জানান দিয়ে যায়,
হঠাৎ করে ভেবে উঠি এই যদি এরকমটা হয় তবে আমি কে?
আমার অস্তিত্ব কোথায়? আমার বেঁচে থাকায় নাকি আমার আমি কে জানার মধ্যে ...
কিছু জানি বোঝা ভীষণ দায়, এমনি করেই তো কাটছে জীবন,
তবে কোথাও যেন আমি শূন্য, আমি নেই ...
আমার সব জুড়েই তো আমি, তবে কেন মনে হয় কিছু নেই
কিছু নেই-টা আবার কি? প্রশ্ন জাগে মনে
আসলে কিছু নেই-টাও যে একটা কিছুই সেটাই বোঝা কঠিন।
ঝড়ো দমকা হাওয়ায় যেমন সব কিছু তছনছ করে দেয়,
জীবন তেমনি মাঝে মাঝেই শূন্যে লড়াই করে,
সবকিছু থেকে ‘আমি’কে অনেক দূরে নিয়ে চলে যায়।
জীবনের ছন্দে গতি মেলা ভার, তবুও প্রতি মুহূর্তে চলে চেষ্টা।
শূন্যকে বুঝতে হবে সে কি চায় কেননা আমি তো সচেতন
চাই চাই করে কি পাই আর কি পাই না সে হিসেব গরমিলে
তাই যা চাই তাকে নিজের করে খুঁজে নিলেই শূন্য কি বুঝবো।

Almost topper

Rubia Sultana
Student, Department of English

I’m not the topper, not the last bench clown,
Just stuck in the middle, wearing an average crown.
I attended the class, even made notes that day,
Watched lectures at 2x, felt like "Okay, slay".

Then laziness hit me like a truck,
Will study tomorrow-- biggest self-suck.
Scrolled reels instead of revising twice,
Brain said "you got this", heart paid the price.

Now the paper is in front, hands shaking cold,
All formulas I knew? Yeah, they left the fold.

MCQs look like all options are right,
To guess or to leave — what a tragic plight.
3 hours feel like 3 years of pain,

Results come: 65%. Not bad, not great.

I promise myself "Next Sem, no break!
New subject drops. Same mistake.

Being average is an art, no cap,
No topper’s stress, no failure’s trap.
Just one lifelong curse we all share —
“I knew it... but forgot it right there!”

THE ATLAS OF PARADOX

RAKA GHOSH
Student, Department of Geography

Celestial bodies, a geography quest!
Instruments and field works, our skills to manifest.
Final sheet awaiting, a challenge to unfold,
But innovation ignites, a burning experience to be told.

Gis and map analysis, a world to explore,
Spatial analysis, our skills to adore.
Technology aids us, our works takes flight,
Maps come alive, with data insight.
Geographic innovation, now our heart calls home,
We emerge as experts, our stories to be known.

‘এক্সপেরিমেন্টাল ব্যাচ’

নন্দিনী সরকার
ছাত্রী, শিক্ষা বিভাগ

সালটা তখন ২০২০, দেখা দিল করোনা
স্কুল কলেজ সব বন্ধ, বন্ধ পড়াশোনা।
সেই সময়ে যারা ছিল দশম শ্রেণীতে
তাদের কথা শোনাই শোনো, চাও যদি শুনতে।
স্কুল জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা হল মাধ্যমিক
সেই পরীক্ষা বাতিল হল শিক্ষার্থীরা হারালো দিগবিদিক।
যারা শিখতো নাচ, গান আরো অনেক কিছু
স্থগিত সবই রাখতে হল, ছাড়তে হলো কিছু।
লক্ষ লক্ষ প্রতিভা সব হারিয়ে গেল নিমেষে
মৃত্যুর পথ বেছে নিল বহু শিক্ষার্থীরা শেষে।
উচ্চমাধ্যমিক ভালোই গেলো, এবার কলেজের পড়াশোনা
এখানে এসে আবার নতুন Experiment এর সূচনা।
"Experimental Batch" হিসেবে নামাঙ্কিত আজ তারা
এত উপহাস সহ্য করেও টিকে রয়েছে যারা।
NEP 2020 সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল যখন
আশার আলো দেখতে পেল "Experimental Batch" তখন।
কিছু শিক্ষার্থী মন থেকে ভালোবাসে পড়াশোনাকে
তাদের জীবন গড়ে উঠুক নতুন স্বপ্নের আলোকে।
হোক না নাম "Experimental Batch" ভাবনা কিছুই নাই
মানুষের মত মানুষ হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।

স্বপ্নের পথে

মৈনাক অধিকারী
ছাত্র, ইংরেজি বিভাগ

রাত পেরিয়ে ভোর যখন
আলো ছড়ায় ধীরে,
নতুন দিনের ডাক আসে
নীরব নদীর তীরে।

হাজার কষ্ট বুকের মাঝে
তবুও থেমে যাই না,
ঝড় এলে পথ হারিয়ে
অন্ধকারে কাঁদি না।

ছোট্ট আশা হৃদয় জুড়ে
জ্বলে প্রদীপ হয়ে,
হার মানিলে জীবন তবে
রঙ হারাবে ধোঁয়ায় ঢেকে।

তাই তো আমি হাঁটি এখনও
স্বপ্ন দু'চোখ ভরে,
একদিন ঠিক পৌঁছে যাব
নিজের গড়া ঘরে।

আমার জীবন

ঋষিতা দে
ছাত্রী, ইংরেজি বিভাগ

আমার জীবন খুব সাধারণ।
প্রতিদিন একইভাবে দিন শুরু হয়।
সকালে ঘুম থেকে উঠে কাজের কথা ভাবি।
কখনো মন ভালো থাকে, কখনো খারাপ।
সব মানুষের মতো আমিও কষ্ট পাই।
কিছু কথা কাউকে বলা যায় না।
অনেক সময় চুপচাপ থাকতে ইচ্ছা করে।
আবার কখনো একা থাকতে ভালো লাগে না।
যাদের আপন ভাবি, তারা সব সময় পাশে থাকে না।
এটা এখন বুঝতে শিখেছি।
তবু সম্পর্কগুলো ধরে রাখার চেষ্টা করি।
কারণ একা জীবন কাটানো কঠিন।
আমারও কিছু স্বপ্ন আছে।
সব স্বপ্ন পূরণ হবে কি না জানি না।
তবু চেষ্টা করি হাল না ছাড়তে।
ভবিষ্যতের কথা ভেবে সামনে এগিয়ে যাই।
জীবনে সুখ আছে, দুঃখও আছে।
দুটো নিয়েই মানুষকে বাঁচতে হয়।
আমিও সবার মতো একটা সাধারণ জীবনে বাঁচছি।
এটাই আমার বাস্তব।

নারী

তনু রায়
ছাত্রী, ইংরেজি বিভাগ

নারী মানে স্বচ্ছ ধারা,
কোমল ফুলের আভা।
আলতা মাখা পায়ে যে তার
মিষ্টি ভাবে চলা।

কখনো সে মায়ের রূপে,
মমতারই আঁচল,
কখনও বা কালী রূপে,
দুষ্ট দমনের বল।

আবার কখনও প্রাচীর ভেঙে,
নতুন জয়ের উল্লাস।
শিক্ষা, কর্মে এগিয়ে করে
আলোকিত সমাজ।

নারী তো দুর্বল নয়,
সে সৃষ্টি, সে প্রেরণা, সে যে শক্তি,
অদম্য ইচ্ছায় ভরা দীপ্তি,
সংগ্রামী এক জাগরণ।

সেমিস্টার পরীক্ষা

অমিত কুমার দাস
ছাত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

সবুজ গাঁয়ের স্বপ্ন চোখে কলেজে রেখেছি পা,
একুশ বছর বয়সে চিনেছি জীবনের পথটি যা।
গুঞ্জবাড়িতে অবস্থিত সেই জ্ঞানের পুণ্যধাম,
ইউনিভার্সিটি বি.টি. অ্যান্ড ইভনিং কলেজ যার নাম।

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে শুরু হলো পথ চলা,
চার বছরের স্নাতক কোর্সে স্বপ্ন অনেক বলা।
মেজর আমার রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজকে চেনার আলো,
দেশ ও শাসনব্যবস্থার কথা শিখি বাসতে ভালো।

দিন কেটে যায় ক্লাসের আলোয়, আসে পরীক্ষার ক্ষণ,
'সেমিস্টার' নামের কঠিন লগ্নে দুরুদুরু করে মন।
বইয়ের পাতায় কাটে সারা রাত, চোখে জাগে সংশয়,
ভোরের আলোয় খাতার পাতায় মেধার পরীক্ষা হয়।

পরীক্ষার দিন শিক্ষাগুরুর স্নেহের আশীষ পাই,
তাঁদের দেখানো আলোর পথেই সত্যেরে খুঁজে যাই।
সেমিস্টার আসে, সেমিস্টার যায় জীবনের নিয়মেতে,
আমরা চলি আলোর পথে, সুন্দর আগামীতে।

Universal Programming Language

Sumanta Lal Ghosh
Teacher, Department of Computer Science

C taught us how to think and create,
Managing memory, building our fate.
C++ came with objects in sight,
Hidden and wrapping with abstraction and encapsulation,
Classes and inheritance shining bright.

Java said, "write once run anywhere",
Making software easy to share.
Python smiled with simple grace,
Helping beginners find their place.
Loops and functions work all day,
Solving problems along the way.

Errors appear but we don't fear
Debugging makes the solution clear.
Programming is more than lines of code
It's creativity on a digital road.

শব্দ

ড. কারিশমা ওঁরাও
অধ্যাপিকা, ইংরেজি বিভাগ

নিস্তব্ধতার মহা গির্জায় জন্ম নিল এক শব্দ,
বয়ে যায় শান্ত নদীর স্নিগ্ধ স্রোতের মতো।
প্রবল অন্ধকারে ভেঙে আসা প্রভাতের রথ,
দেখাতে পারে বাক্যই একমাত্র পথ।

সে অদৃশ্য পথে ভ্রমণ করে মজ্জা ও মনের ভেতর,
মানবজাতির অন্তরে সেলাই করে অন্তরের অক্ষর।
প্রথম আগুন শেখেনি যখনও জ্বলে উঠতে ধীরে,
শব্দেরা তখনও স্বপ্ন দেখত মহাজাগতিক নীলে।

তারা ভেসে বেড়ায় বসন্তের বাতাসে প্রজাপতির মতো,
শব্দের বাগানে রঙিন ফুল ফোটে কত শত।
সে ঘুমিয়ে ছিল প্রাচীন পাথরের পাঁজরের অন্তরালে,
নিস্তব্ধ পৃথিবীকে নিজের করে নেবার প্রতীক্ষা কালে।

সাম্রাজ্য হারিয়ে যায় বিস্মৃতির পদচিহ্নের তলে,
তবু শব্দ বেঁচে থাকে মৃত স্মৃতিস্তম্ভের পরে।
প্রতিটি অক্ষর আত্মা ও আগুনের এক একটি পরমাণু,
বিশৃঙ্খলাকে দেয় ইতিহাস, বেদনাকে দেয় পরিচয় ও প্রাণ।

অ নু বা দ গ ল্প

চিড়িয়া ভাগল বা

রাশিয়ান সাহিত্যিক আন্তন চেকভের ছোটগল্প "Неудачный визит"
"Neudakhny Vizit" (Unsuccessful Visit) থেকে অনূদিত

ড. অনিন্দ্য ভট্টাচার্য
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

ইলিয়া সেরগেইচ পেপলভ আর তার বউ ক্লিওপেট্রা পেট্রোভনা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আড়ি পাতছিল। দরজার ওপাশে ছোট ড্রয়িং রুমে তাদের মেয়ে নাতাশা আর মিউনিসিপ্যালিটি স্কুলের শিক্ষক চুপকিনের কথাবার্তা চলছিল। তাদের আলাপটা শেষমেশ বিবাহপ্রস্তাব পর্যন্ত এগোয় কি না, এই উৎকণ্ঠা নিয়ে কর্তা-গিন্নি অপেক্ষা করছিল।

"এইবার ছিপে টান দিয়ে মাছ তুলতে হবে," পেপলভ উত্তেজনায় হাত ঘষতে ঘষতে ফিসফিস করে বলল, "বুঝলে গিন্নি? বাবাজীবন যেই একটু বেকায়দায় পড়বে, তুমি দেয়াল থেকে মাতা মেরির ছবিটা খুলে নিয়ে আসবে, আমি

দৌড়ে গিয়ে ওদের আশীর্বাদ করে ফেলব। যাকে বলে একেবারে হাতে-নাতে... বুঝলে কি না? পবিত্র মাতা মেরির ছবি নিয়ে মেয়ের বাবা-মায়ের আশীর্বাদ মানে বিয়ে পাকা ... কোর্টে গিয়েও ছাড়াতে পারবে না..."

এদিকে ড্রয়িং রুমে যে কথাবার্তা চলছিল তা এই রকমঃ

"আরে তোমার চরিত্রের কথা আসছে কেন?" চুপকিন একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে বলছিল, "তোমাকে আমি আদৌ কোন চিঠি দিই নি।"

"আ-হা। আমি যেন তোমার হাতের লেখা চিনি না?" বলে নাতাশা হিহি করে একটা কৃত্রিম হাসি হাসল, "আমি তো বাবা সঙ্গে সঙ্গেই চিনেছি। আচ্ছা, এই যে তুমি একজন সাহিত্যের শিক্ষক, ছাত্রদের লেখালিখি করা শেখাও, তোমার নিজের হাতের লেখা এত খারাপ কেন? মনে হয় যেন আরশোলা কালিমাখা পায়ে হেঁটে গেছে। ছাত্ররা তোমার কাছ থেকে কি শিখবে বলো তো?"

"হুম। তাতে কি আসে যায়?" চুপকিন বলল, "হাতের লেখার ক্লাসে লেখাটা কোন মূল বিষয় না। দেখতে হয় ছাত্ররা কোন বজ্জাতি করছে কি না। এর মাথায় স্কেল দিয়ে হাল্কা টোকা, ওর হাঁটুতে একটা বাড়ি ... হাতের লেখা নিয়ে এত মাথা ঘামানোর কি আছে? এই যেমন ধরো নেক্রাসভের মত একজন লেখক। কি ভয়ানক হাতের লেখা। ওনার রচনাসমগ্রতে মূল পাণ্ডুলিপির ছবি আছে।"

"কোথায় লেখক নেক্রাসভ আর কোথায় তুমি..." নাতাশা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আহা যদি একজন লেখকের সাথে আমার বিয়ে হত? তাহলে সে সব সময় আমাকে নিয়ে কবিতা লিখে শোনাতো।"

"এ আর এমন কি ব্যাপার? তুমি কবিতা পছন্দ করলে আমি লিখে দিতে পারি।"

"কি নিয়ে লিখবে শুনি?" নাতাশা জিজ্ঞেস করল।

"এই ধরো অনুভূতি ... ভালোবাসা ... তোমার চোখদুটো নিয়েও লিখে দিতে পারি। যা পড়ে তোমার চোখে জল আসবে..." চুপকিন কবি-কবি ভাব নিয়ে বলল, "কিন্তু আমি যদি তোমাকে কয়েকটা কবিতা লিখে দিই, তুমি কি আমাকে তোমার হাতে চুম্বন করতে দেবে?"
"এ আর এমন কি ব্যাপার? চাইলে এখনই করতে পারো।"
এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে বিস্মিত চুপকিন লাফিয়ে উঠে গোল গোল চোখ করে নাতাশার কাপড়কাচা-সাবানের গন্ধমাখা হাতটা ধরল।

"এইবার। গিন্নি। ছবি নামাও!" উত্তেজনায় পেপলভ তার বউয়ের পাঁজরে কনুইয়ের গুঁতো মেরে ফিসফিস করে বলল, "চলো। এবার ঢুকব আমরা!"

আর এক সেকেন্ডও সময় নষ্ট না করে দড়াম করে দরজা খুলে পেপলভ ড্রয়িং রুমে ঢুকল। "জামাই," আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলে বলতে লাগল, "ঈশ্বর তোমাকে আর আমার মেয়েকে আশীর্বাদ করুন। তোমাদের জীবন সুখী হোক, সুন্দর হোক, ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ হোক, পরিবার বেড়ে উঠুক..."

"আমিও তোমাদের অনেক অনেক আশীর্বাদ করি," আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে ক্লিওপ্যাট্রা বলল, "সুখে থেকো, আমার সোনারা।" চুপকিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার একমাত্র সোনার টুকরো মেয়েটা তুমি নিয়ে যাচ্ছ। ওকে দেখে রেখো, ভালো রেখো..."

চুপকিন আঁতকে উঠে মহা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল। নাতাশার বাবা-মা যে এমন অতর্কিতে হামলা করতে পারে, তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। মুখ দিয়ে কোন কথাও বেরোচ্ছে না, কারণ কি করা উচিত তা মাথায় আসছে না।

“ফেঁসে গেছি। আর বেরোনোর কোনো রাস্তা নেই। হে ভগবান রক্ষা করো” এই চিন্তাটাই আপাতত তার মনে এল, আর ভয়ে সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বিনীতভাবে কিছুটা বলির পাঁঠার ভঙ্গিতে সে আশীর্বাদ নেবার জন্য মাথা নিচু করল।

“নাতাশা মা, ওর পাশে দাঁড়াও...” পেপলভ চোখে আনন্দের অশ্রু নিয়ে বলল, “আশীর্বাদ করি তোমাদের... ইয়ে, গিন্নি, মাতা মেরির ছবিটা ওদের সামনে ধরো ...”

হঠাৎই পেপলভ কান্না থামিয়ে থমকে দাঁড়াল। রাগে দাঁত খিঁচিয়ে সে বউয়ের দিকে চোখ পাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, “গর্দভ। মাথামোটা কোথাকার। এটা মাতা মেরির ছবি?”

“ও মাগো! হায় ভগবান!” ক্লিওপেট্রা চিৎকার করে উঠল।

হল কি ব্যাপারখানা? বেচারা শিক্ষক ভয়ে ভয়ে মাথা তুলে দেখল, এবারকার মত সে বেঁচে গেছে। তাড়াহুড়োয় মাতা মেরির পবিত্র প্রতিকৃতির বদলে ভদ্রমহিলা যে ছবিটা নামিয়ে এনেছেন, সেটা বিখ্যাত লেখক ইভান লাজেচনিকভের একটা ছবি। বুড়ো পেপলভ আর তার বউ কি করবে বা কি বলবে কিছুই ঠাহর করতে পারছে না। ছবিটা হাতে নিয়ে হাঁ করে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই অসাধারণ গোলমালের সুযোগ নিয়ে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা নীতি অনুসরণ করে চুপকিন দরজা দিয়ে সোজা দৌড়ে পালালো।

ফিরে আসার রাতে

প্রিয়াঙ্কা কুণ্ডু
ছাত্রী, ইংরেজি বিভাগ

সাঁ করে একটা গাড়ি পিছন থেকে চলে গেল। ফাঁকা রাস্তা, শুনশান। অমাবস্যার রাত, রাস্তায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। অনেকটা দূরে একটা স্ট্রিট লাইটের ঘোলাটে আলো দেখা যাচ্ছে। দূরে কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করছে। আচমকা একটা ট্রাক হর্ন বাজাতে বাজাতে চলে গেল। দূরে রাস্তার আলোটা মাঝে মাঝে জ্বলছে আর নিভছে।

নিজের ফোনের শব্দেই আঁতকে উঠে দেখি মায়ের ফোন। “কিরে কোথায় রে তুই, এতো দেরি হচ্ছে কেন? কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠলাম “আসছি”। তখনও যে বাস পাইনি তা মাকে বলতে সাহস হলো না। বারে বারে কেন জানিনা মনে হচ্ছে কেউ আমার পিছন পিছন আসছে। অবশেষে অনেক দূরে একটা বাসের হেডলাইট দেখতে পেলাম। ভেবেছিলাম আর একটু কাছে এলে তবে হাত দেখিয়ে থামাব। কিন্তু হঠাৎ দেখি বাসটা এক্কেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি কিছু বুঝে উঠতে উঠতেই কন্ডাক্টর ডেকে উঠলেন "ও দিদি, তাড়াতাড়ি আসুন। সময় নেই বেশি, রাস্তায় আরও লোক অপেক্ষা করছে যে।" কেন জানি না আমার সারা শরীর শিউরে উঠল। কিছু না ভেবে তড়িঘড়ি করে বাসে উঠে পড়লাম। বাসে উঠে কন্ডাক্টরকে বললাম "দাদা বেলতলা যাব ভাড়াটা নিন"। কন্ডাক্টর এক অদ্ভূত উত্তর দিল আমায়, "কি হবে এই টাকা দিয়ে যদি সেটা কাজেই না লাগাতে পারলাম। সবই তো নশ্বর এই পৃথিবীতে।" কন্ডাক্টরের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। দেখলাম আমার পাশে বসে থাকা লোকটাকে। লোকটার বাম পাশের চোখের পুরো জায়গাটায় এক বিরাট ক্ষত। আমি কন্ডাক্টরকে বললাম "দাদা এর চোখ দিয়ে তো রক্ত পড়ছে হাসপাতাল নিয়ে যেতে হবে।" ওই ভদ্রলোক বললেন "লাগবে না। গত ছয় বছর ধরে এটা এভাবেই আছে। কিচ্ছু লাগবে না।"

হঠাৎ খেয়াল হলো আমার স্টপেজ এসে গেছে। বুঝতেই পারলাম না কি করে এত তাড়াতাড়ি চলে আসলাম। এইদিকে বাস কন্ডাক্টর আমায় ডাকছে নেমে পড়ার জন্য। আমি তাড়াতাড়ি করে নামতে যাবো এমন সময় কে যেন পিছন থেকে বলে উঠল "দেখে নামবেন, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আবার আমাদের মতন অশরীরী হয়ে যাবেন না যেন"। পিছন ফিরে দেখি বাসের সমস্ত লোক একসাথে হো হো করে

হাসছে। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে যেতে লাগলো। বুকের ভেতর হৃদপিন্ডটা যেন বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সারা শরীর হিম হয়ে গেল। বাস থেকে নেমে দ্রুত হাঁটতে থাকলাম। বুকের ভেতরের ধুক ধুক শব্দটা এখনও রয়েই গেছে। একজন পথচারী পিছন থেকে বলে উঠল "এত রাতে এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কোন গাড়িতে আসলেন?"

আমি আবার আঁতকে উঠলাম। "কে আপনি?”

বৃদ্ধ লোকটির কাছে শুনলাম, ছয় বছর আগে জুলাই মাসে অমাবস্যার দুর্যোগের রাতে এই পথেই এক বিরাট রোড অ্যাকসিডেন্ট হয়। তাতে একটা বাসভর্তি অনেক লোক মারা গেছিল। কাউকেই বাঁচানো যায় নি। আজও ওই দিনে অমাবস্যার বৃষ্টিভেজা রাত নামলেই নাকি ফিরে আসে ওই বাসটি যাত্রী সহ।

হয়তো সেই রাতে আমি ওই অশরীরীদেরই সহযাত্রী হয়েছিলাম।

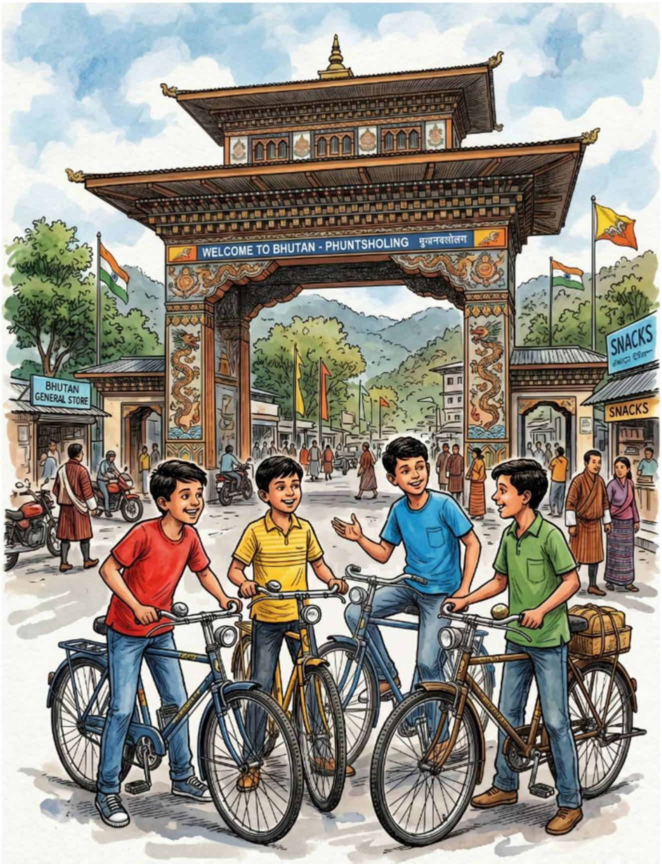

একটি অসম্পূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার

অনুরাগ রায়
ছাত্র, বাংলা বিভাগ

সবেমাত্র গরমের ছুটি শুরু হয়েছে। আমরা আটজন বন্ধু একসাথে দেখা করলাম। প্রত্যেকে একই স্কুলের নয়, তবে বন্ধু। কেউ কেউ রামভোলা স্কুলের, কেউ মণীন্দ্রনাথ স্কুলের। অনেকে আবার কলেজের ছাত্র। আলোচনা

করে ঠিক করলাম, পরের দিন সাইকেল নিয়ে সবাই জয়গাঁও ঘুরতে যাব; সবাই রাজি হল। আমি তখন রামভোলার ছাত্র।

আগে জানতাম না যে জয়গাঁও কতটা দূর। পরের দিন সবাই সময়মতো সকাল ছয়টায় সাইকেল নিয়ে তৈরি ছিল। আমরা খাগড়াবাড়ি থেকে রওনা দিয়ে পুণ্ডীবাড়ির রাস্তার দিকে সাইকেল নিয়ে যেতে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর মেইন রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে গেলাম তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য। কুড়ি শতাংশ রাস্তা যেতে না যেতেই এক বন্ধু গোপাল বলে, সে যাবে না, বাড়িতে কাজ আছে, যেতে হবে। গোপাল চলে যায়। আমরা সাতজন যেতে থাকি, তারপর অনেকটা সাইকেল চালানোর পর পাশের একটি মাঠে দাঁড়িয়ে টিফিন করি পাউরুটি ও বিস্কুট।

কিছুক্ষণ পর ফের সাইকেল চালানো শুরু করি তবে আবার মেইন রাস্তার পাশে চিলাপাতা ফরেস্ট এর রাস্তা দিয়ে। আমাদের মধ্যে বড়ো কলেজে পড়ে রিক দা। সে মোবাইল বের করে গুগল মানচিত্র বের করে ছোট রাস্তা খোঁজে। আমরা তার কথামতো যেতে থাকি, মাঝখানে একটা নদী। এটা পার করলে আমাদের এগারো কিলোমিটার বেঁচে যায়, আর যদি মেইন রাস্তা দিয়ে যাই তাহলে বেশি খাটুনি। আমরা নদীতে নৌকা দেখে নৌকার দাদাটাকে ডেকে বলি দাদা, আমরা পার হব। আমাদের পার করে দেবে? উত্তরে সে বলে প্রতিজন এর দশ টাকা করে লাগবে। আমরা সাইকেল নিয়ে নৌকায় উঠি এবং পার হয়ে আসি। তারপর মেইন রাস্তা, যেখান দিয়ে বড়ো বড়ো ট্রাক, গাড়ি যাচ্ছে। আমরা সাইকেল চালাতে থাকি, পা ব্যথা হয়ে আসলে একজন আরেকজনের ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে যাই।

ধীরে ধীরে রাস্তা উঁচু হতে থাকে। পাহাড়ি এলাকায় ঢুকতে থাকি, দূর থেকেই আমরা পাহাড় দেখতে পাই। পা ব্যথা হওয়া সত্ত্বেও একটা আলাদা সুন্দর অনুভূতি হয়। আমরা প্রায় জয়গাঁও এর কাছাকাছি গিয়ে একটা দোকানে পৌঁছে পরোটা কিনে খাই। তারপর সাইকেল হেঁটে নিয়ে

যাই, দেখি চারিদিকে সুন্দর পাহাড়। আমরা যাত্রাপথ নিয়ে আলোচনা করছিলাম আর অনেক ছবিও তুলি। পাশেই একটা বড়ো বুদ্ধমূর্তি ছিল তার ছবি তুলি। তারপর আমরা জয়গাঁও থেকে নেমে গুগল এর সাহায্যে কিছুটা সাইকেল চালিয়ে পৌঁছে যাই ভুটান বর্ডার গেটে। সেখানে পুলিশ কাকুকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি ভুটান যেতে কোনরকম টাকা লাগে না, শুধু লাগে আধার কার্ড। তখন সবার মনে একটাই ভাবনা এসেছিল, ইস, যদি আধার কার্ডটা নিয়ে আসতাম।

সবাই আছে, তবু কেউ নেই

জয়িতা রায়
ছাত্রী, ইংরেজি বিভাগ

ইরা একটি প্রাণোচ্ছল, সহজ সরল মেয়ে। ইরার বাবা শহরের একজন ব্যস্ত ব্যবসায়ী ও তার মা একজন শিক্ষিকা। বাইরে থেকে তাদের পরিবারকে খুব সুন্দর আর গোছানো মনে হতো। কিন্তু সেই সুন্দর ছবির আড়ালে কোথাও যেন একটা শূন্যতা লুকিয়ে ছিল। কাজের ব্যস্ততায় বাবা-মা আস্তে আস্তে ইরার ছোট ছোট কথাগুলো শুনতে ভুলে গিয়েছিলেন। স্কুল থেকে ফিরে ইরা উৎসাহ নিয়ে সারাদিনের সব গল্প বলতে চাইতো তার বাবা-মা কে, কিন্তু কেউ সময় করে শুনতো না। কখনো বাবা ফোনে ব্যস্ত থাকতেন, আবার কখনো মা খাতা দেখায় ডুবে থাকতেন। বাড়িতে থেকেও ইরা যেন একা হয়ে পড়েছিল। বন্ধু, বান্ধবীরাও তাকে খুব একটা পাত্তা দিত না। আড্ডার ভিড়ে ইরার কথা মাঝপথেই থেমে যে। তার অনুভূতিগুলো কেউ বুঝতে চাইত না। তবু ইরা প্রতিদিন অপেক্ষা করতো হয়তো কেউ একদিন হঠাৎ জিগ্যেস করবে, "তুই কেমন আছিস?"

রাতের অন্ধকারে জানালার পাশে বসে ইরা মাঝে মাঝে ভাবত, মানুষের ভিড়ের মধ্যেও এত একা লাগতে পারে কিভাবে। তার খুব বেশি কিছু চাওয়ার ছিল না শুধু একটু সময়, একটু মনোযোগ, আর নিজের অস্তিত্বটুকুর স্বীকৃতি।

ক্যানভাস

বীথি সূত্রধর
ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

নীল আকাশটার দিকে তাকালেই অবন্তীর মনে হতো, জীবনটা যেন একটা মস্ত বড় ক্যানভাস। কিন্তু তার নিজের জীবনের ক্যানভাসটা ছিল ভীষণ ধূসর। মধ্যবিত্ত পরিবারের বড় মেয়ে সে। ছোটবেলা থেকেই অবন্তী শুনে এসেছে,

"মেয়েরা হলো পরের ধন।" নিজের ইচ্ছা, ভালো লাগা বা স্বপ্নের কোনো আলাদা মূল্য থাকতে পারে, সেটা তার জানা ছিল না।

অবন্তীর বয়স তখন চব্বিশ। পড়াশোনা শেষ হতেই পরিবার থেকে বিয়ের তোড়জোড় শুরু হলো। পাত্রপক্ষ এসে তাকে দেখে গেল, গায়ের রঙ পরখ করল, আর মৃদু হেসে বলল, "মেয়ে তো বেশ শান্ত-শিষ্ট।" অবন্তীর মনে হলো, সে কোনো মানুষ নয়, বরং হাটের কোনো পুতুল। তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়েই ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল শহরের এক ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলের সাথে।

বিয়ের পর অবন্তীর জীবনটা বদলে গেল, কিন্তু ভালো অর্থে নয়। নতুন বাড়িতে তার পরিচয় হলো কেবল একজন ভালো গৃহিণী হিসেবে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শাশুড়ির আদেশ পালন, রান্নাবান্না আর সংসারের খুঁটিনাটি কাজেই কেটে যেত তার দিন। স্বামী অয়ন মানুষ হিসেবে খারাপ ছিল না, কিন্তু সে অবন্তীকে একজন জীবনসঙ্গী ভাবার চেয়ে ঘরের দায়িত্ব সামলানোর কর্মী ভাবতেই বেশি পছন্দ করত। অবন্তীর ভেতরের রঙতুলির শখ, ছবি আঁকার ভালোবাসাগুলো সেই চার দেয়ালের মাঝে আস্তে আস্তে দমবন্ধ হয়ে মরতে বসল।

একদিন দুপুরে আলমারি গোছাতে গিয়ে অবন্তী তার পুরনো ড্রয়িং খাতাটা খুঁজে পেল। ধুলোমাখা খাতাটার পাতা ওল্টাতেই তার চোখে জল চলে এল। কত স্বপ্ন ছিল তার! সে তো শুধু চার দেওয়ালে বন্দি থাকার জন্য জন্মায়নি। সেদিনই অবন্তী মনে মনে এক কঠিন সিদ্ধান্ত নিল। সে অয়নকে বলল, সে আবার ছবি আঁকা শুরু করতে চায় এবং একটি স্থানীয় স্কুলে আর্ট টিচার হিসেবে জয়েন করতে চায়। অয়ন অবাক হয়ে বলল, "আমাদের সংসারে তো টাকার অভাব নেই, তাহলে বাইরে কাজ করার কী দরকার?" শাশুড়ি আড়ালে টিপ্পনী কাটলেন, "বউয়ের ডানা গজাচ্ছে!" কিন্তু অবন্তী

এবার আর চুপ করে থাকল না। সে শান্ত গলায় বলল, "এটা টাকার জন্য নয়, এটা আমার নিজের অস্তিত্বের জন্য।"

শুরুর দিনগুলো সহজ ছিল না। ঘরের সব কাজ শেষ করে তবেই সে স্কুলে যেত। রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত, অবন্তী তখন লণ্ঠনের আলোয় ক্যানভাসে রঙ ছড়াত। তার তুলির টানে ফুটে উঠত খাঁচাবন্দি পাখির মুক্তির গল্প, কখনো আবার অন্ধকার পেরিয়ে সূর্যের আলোয় ভেসে যাওয়া কোনো মেয়ের মুখ।

কঠোর পরিশ্রমের ফল মিলল দু-বছর পর। অবন্তীর আঁকা ছবিগুলো শহরের একটি বড় প্রদর্শনীতে জায়গা করে নিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধনের দিন অবন্তী তার পুরো পরিবারকে আমন্ত্রণ জানাল। অয়ন যখন প্রদর্শনীর হলে ঢুকল, সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। চারদিকের দেয়ালে অবন্তীর আঁকা অসাধারণ সব ছবি ঝুলছে, আর মানুষ মুগ্ধ হয়ে তার স্ত্রীর প্রশংসা করছে। একটি ছবির নিচে ক্যাপশন ছিল 'যাও, পাখি'। অয়ন বুঝতে পারল, সে এতদিন অবন্তীর ভেতরের প্রতিভাকে কতটা অবহেলা করেছে। সেদিন বাড়ি ফেরার পথে অয়ন অবন্তীর হাতটা শক্ত করে ধরল। বলল, "আমাকে ক্ষমা করো অবন্তী, আমি তোমার ভেতরের শিল্পীকে দেখতে পাইনি। আজ থেকে তোমার এই উড়ানে আমি তোমার পাশে আছি।"

অবন্তী জানালার বাইরে তাকাল। রাতের আকাশটা আজ আর ধূসর লাগছিল না। আজ সে সত্যিই মুক্ত। সে বুঝেছে, সমাজ বা পরিবার যতই শিকল পরাক না কেন, নিজের ডানার ওপর বিশ্বাস থাকলে একদিন আকাশে ওড়া সম্ভব। অবন্তী এখন আর শুধু কারও স্ত্রী বা পুত্রবধূ নয়, সে নিজের পরিচয়ে একজন সফল শিল্পী।